বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সংজ্ঞা অনুসারে স্বাস্থ্য (মানসিক) অর্থ কথায় কেবল রোগমুক্ত অবস্থাই নয়, তা আসলে কোনো মানুষের সর্বাঙ্গীণ সুস্থতা ও ভালো থাকার অনুভূতির পরিচায়ক।

WHO-র ভাষায়—health is a state of total subjective well being and not merely absence of diseases and disorder।

এই ভালো থাকার অনুভূতির সঙ্গে দুটি বিষয় সরাসরি সম্পর্কিত ঃ

- সামাজিক সম্পর্ক ও মানুষের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত অনুভূতি কাজ করে।
- আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের (APA Scale) মতে, ভালো থাকার মানসিক অনুভূতি বা মানসিক স্বাস্থ্যের পরিমাপ একটা Continum বা অবিচ্ছিন্ন স্কেলের ধারণা অনুসারে করতে হয় যাকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে global functioning level বলে অভিহিত করা হয়।

একজন মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর, যেমন—

(১) সে নিজের সম্বন্ধে কী ধরনের ধারণা পোষণ করে?

(২) যে-কোনো বাস্তব পরিস্থিতিকে সে কীভাবে অনুভব করে?

(৩) তার নিজের আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self Control) ক্ষমতা কতটা শক্তিশালী?

(৪) তার প্রাক্ষোভিক বিকাশ (emotional development) কতটা? অর্থাৎ, সে নিজের অনুভূতি, দ্বন্দ্ব, নৈরাশ্য, দুশ্চিন্তা জাতীয় বিষয়গুলোকে আপন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম কিনা।

(৫) যে-কোনো পেশায় কাজ করার ক্ষেত্রে তার দক্ষতা কতটা? অর্থাৎ, পেশাগত চাহিদা পূরণে সে কতটা সক্ষম?

Scanned with CamScanner

(৬) তার আত্মসচেতনতার (Self awareness) স্তর কতটা বিকশিত? অর্থাৎ, সে নিজের সক্ষমতা ও অক্ষমতা সম্বন্ধে কতটা ওয়াকিবহাল। ***Hans Selye***-র Stress Scale অনুসারে পজিটিভ বা ইউস্ট্রেস ও নেগেটিভ বা ডিস্ট্রেস মোকাবিলা করার জন্য উপযুক্ত মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন, যাঁরা সহজেই সবদিকেই ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ—বিয়ে একটা Eustress বা আত্মীয়বিয়োগ একটা Distress-এর ঘটনা যেখানে মানসিক স্বাস্থ্যবান মানুষ সমানভাবে ভারসাম্য বজায় রেখে মানিয়ে চলতে পারেন।

বিজ্ঞানী ***Coleman***-এর ভাষায় সংগতিবিধানের চাহিদা (adjustive demands) মূলত পাঁচটি বিষয়-নির্ভর :

Conflict ; Anxiety ; Pressure ; Frustration ও Tension। যাঁরা এইসব সমস্যার সঙ্গে নিজেকে উপযুক্তভাবে মানিয়ে নিতে পারেন তাঁরা-ই প্রকৃত অর্থে মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন মানুষ।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও এর পটভূমিকা :

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান কথাটি মূলত গ্রিক শব্দ 'হাইজিয়া' থেকে নেওয়া। যার অর্থ 'স্বাস্থ্যের দেবী'। স্বাস্থ্য বলতে কেবল শারীরিক সুস্থতাই নয়, তার সঙ্গে মানসিক সুস্থতাকেও বোঝায়। প্রাচীনকালের মানুষের এই ধারণা ছিল না। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের জন্ম ও বিকাশ এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে হয়েছে। ফরাসি বিপ্লবের সময় ড. *ফিলিপ পিনেল* মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীদের সঙ্গে মানবিক আচরণের জন্য দাবি জানিয়ে মানবসভ্যতার এই বিষয়টিতে এক নতুন প্রগতিশীল ভাবধারার জন্ম দেন। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ারে ডিউক মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীদের উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগের কথা বলেন। দার্শনিক *রুশো* তাঁর শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার মতবাদের মধ্যে দিয়েও এই মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি আরও পাকাপাকিভাবে শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে আসেন। পরবর্তীকালে ড. *সিগমন্ড ফ্রয়েড* তাঁর মনের তিনটি স্তরের ব্যাখ্যার মাধ্যমে মনঃসমীক্ষণের জগতে এক আলোড়ন তোলেন।

বিংশ শতকের গোড়ায় এক চব্বিশ বছরের যুবক *ক্লিফোর্ড বিয়ার্সের* পাঁচতলার জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা, বিভিন্ন উন্মাদ আবাসে বেশ কয়েক বছর কাটানো, অবশেষে সুস্থ হয়ে "A mind that found itself" নামক বই রচনা ও সর্বোপরি *এ্যাডলফ মেয়ারের* সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আন্দোলন ও গবেষণা, এই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিষয়টির ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথে এক সুনির্দিষ্ট রূপরেখা এঁকে দেয়। এর পর থেকে একের পর এক আইন প্রণয়ন হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষ মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিষয়ে সচেতন হতে থাকে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য :

(১) কোনো ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা রক্ষা করা।

(২) সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সুষম ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করা।

(৩) মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের রোগনিরাময়ে সাহায্য করা।

(৪) বিপথগামী, উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদের জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা।

(৫) অসামাজিক ও অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের সমাজে যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

(৬) ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন, সমাজজীবন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সাহায্য করা।

(৭) এই বিষয়ে দক্ষ সমাজকর্মী, শিক্ষক ও কাউন্সেলারদের আধুনিক বিজ্ঞানের ধ্যানধারণা বিষয়ে অবহিত করা।

সমাজে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ভূমিকা :

আধুনিক সমাজজীবনের জটিলতার মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। এই বিষয়টি কোনো এক ব্যক্তিজীবনে চারটি মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে সাহায্য করে—

(১) প্রত্যেক মানুষের যে স্বাভাবিক সম্ভাবনাগুলি সুপ্ত থাকে তার যথাযথ বিকাশে সহায়তা করে।

(২) ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়গুলির মধ্যে অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক এবং সর্বোপরি আধ্যাত্মিক দিকগুলির মধ্যে এক সুস্থ সামঞ্জস্য বজায় রাখে।

(৩) জীবনের প্রাণশক্তির মধ্যে যথাযথ ভালো, সুস্থ, জীবনমুখী ধারাগুলিকে ফুটিয়ে তুলে কোনো ব্যক্তিকে সুখী রাখে যাতে সে তার নিজ লক্ষ্য পূরণে সচেষ্ট ও সফল হতে পারে।

(৪) কোনো ব্যক্তির আপন যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুসারে উপযুক্ত কর্মক্ষম, সফল ও সার্থক জীবনধারণে সাহায্য করা, যাতে সেই ব্যক্তি সমাজের বিভিন্ন কাজে তার দক্ষতাগুলিকে ঠিক ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে।

সমাজের একটি একক হল একজন ব্যক্তি। কাজেই তার উপযুক্ত মানসিক সুস্থতা যে শুধু তাকেই সফল করে তোলে তাই নয়। এতে বৃহত্তর সমাজেরও প্রভূত উপকার সাধিত হয়ে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার পরিবার ও বৃহত্তর সমাজের ধারক ও বাহক। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, এই ব্যক্তির মানসিক সুস্থতার প্রধান লক্ষণগুলি নির্দেশ করে থাকে।

Scanned with CamScanner

মানসিক স্বাস্থ্য কী?

যে শক্তি বা প্রক্রিয়া মানুষকে তার শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সুস্থ সামঞ্জস্যবিধান করতে সাহায্য করে তাকেই মানসিক স্বাস্থ্য বলে।

মন বলতে আমরা মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের পারস্পরিক সংহত ক্রিয়াকেই বুঝি। কাজেই স্বাস্থ্য বলতে শরীর ও মন উভয়েরই সুস্থ, সংগতিপূর্ণ সক্রিয়তাকে বোঝায়। ব্যক্তিত্ব বা অস্মিতার (Personality) সুস্থ, সুন্দর বহিঃপ্রকাশকেই মানসিক স্বাস্থ্যের সঠিক মাপকাঠি বলে ধরে নেওয়া যায়।

মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ :

বিভিন্ন সময়ে মনোবিদগণ নানাভাবে এই সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করেছেন। তবে মোটামুটি নীচে উল্লিখিত বিশেষত্বগুলিই কোনো ব্যক্তির মানসিক সুস্থতার পরিচায়ক—

(১) যথাযথ শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক (intellectual), প্রাক্ষোভিক (emotional) ও সামাজিক বিকাশ, অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি দৈহিক গঠনে স্বাভাবিক, মানসিকভাবে ভারসাম্যযুক্ত, বৌদ্ধিক কাজে অংশগ্রহণে সক্ষম, প্রাক্ষোভিক দিক থেকে পরিণত এবং সামাজিকভাবে দায়িত্বসচেতন।

(২) আত্মনির্ভরশীল, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও আত্মসচেতন।

(৩) দৈনিক আচরণগত সুঅভ্যাসের অধিকারী।

(৪) জীবনদর্শন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা এবং তা অর্জনের উপায় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন (possessing inner vision)।

(৫) উদ্যমী, পরিশ্রমী ও যুক্তিবাদী।

(৬) শান্ত, ধৈর্যশীল ও যে-কোনো পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা।

(৭) গঠনমূলক কাজে অংশ নেওয়ার আগ্রহ ও ইচ্ছা।

সুন্দর মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী যে-কোনো মানুষ সমাজের কাছে সম্পদ। সে শুধু নিজে সফল হয় তা-ই নয়, তার চারপাশের সবাইকেও সুন্দরভাবে সাফল্যের পথে চালিত করে। কাজেই গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং-এর মূল কথাই হল যে-কোনো পেশার বা বয়সের মানুষের মধ্যে সুন্দর মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করা।

মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হবার সম্ভাব্য কারণ :

নিম্নলিখিত কারণগুলির যে-কোনো একটি বা একাধিক কারণ মিলিতভাবে কোনো ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট করতে পারে—

(১) জন্মগতভাবে যদি জিনের গঠনে কোনোরকম ত্রুটি থাকে।

(২) মস্তিষ্কে আঘাতজনিত কারণে বা কোনো স্নায়ুর অসুখে যদি স্থায়ী বা সাময়িক মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে থাকে।

(৩) কোনো ধরনের শারীরিক বিকৃতি বা দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতা।

(৪) অপুষ্টিজনিত অসুস্থতা ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস।

(৫) অনিদ্রা, অবসাদজনিত শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি।

(৬) মদ বা ড্রাগে আসক্তিজনিত শারীরবৃত্তীয় ক্ষতি।

(৭) পারিবারিক অশান্তি, মা-বাবার বিচ্ছেদ বা পারিবারিক ভাঙন।

(৮) অভিভাবকদের উদাসীনতা বা অতিরিক্ত সাবধানতা।

(৯) বৈষম্যমূলক আচরণ অর্থাৎ, তুলনা করা ও কাউকে বেশি ভালোবাসা বা কম ভালোবাসা।

(১০) অবাস্তব চাহিদা চাপিয়ে দেওয়া, যা কারও ক্ষমতার গণ্ডির বাইরে।

(১১) কর্মক্ষেত্রে বা স্কুলের পরিবেশের মধ্যে কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য।

(১২) খারাপ সঙ্গ যা সামাজিক মূল্যবোধকে নষ্ট করে দেয়।

(১৩) অতিরিক্ত যৌনতা বা হিংসামূলক সিনেমা দেখার কুফল।

(১৪) আধুনিক জীবনযাত্রার ও প্রতিযোগিতার টেনশন।

(১৫) উগ্রপন্থী কার্যকলাপ, যুদ্ধ বা দাঙ্গাজনিত অশান্তি।

(১৬) যে-কোনো প্রকারের যৌন-নির্যাতন বা বলাৎকার।

(১৭) দারিদ্র্যজনিত কষ্ট, হতাশা।

(১৮) পারিপার্শ্বিক খারাপ পরিবেশের প্রভাব।

(১৯) কর্মক্ষেত্রে হতাশা।

(২০) আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব।

(২১) সবসময় এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতা বা আত্মগ্লানিতে ভোগা।

(২২) পরিবেশের নানাপ্রকার দূষণের শারীরিক প্রভাব—যেমন, বায়ুদূষণ, জলদূষণ বা শব্দদূষণের কুফল।

(২৩) একাকীত্ব।

(২৪) নিকটজনের দীর্ঘ অসুস্থতা বা মৃত্যু।

(২৫) বেকারত্বের জ্বালা বা কর্মহীনতা।

Scanned with CamScanner

মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে অভিযোজনের সম্পর্ক (Relation between mental health and adjustment) :

পরিবেশের সঙ্গে অহরহ মিথস্ক্রিয়ার ফলে ব্যক্তি এগিয়ে চলে। একেই বলে সংগতিবিধান। এই মিথস্ক্রিয়ার ফল সবসময় মসৃণ ও বাঞ্ছিত পথ ধরে চলে না। অনেক প্রতিকূলতা ও বাধাবিপত্তি দেখা যায়, যার ফলে ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব, ব্যর্থতা, হতাশা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। একজন মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ ব্যক্তি ব্যর্থতা, হতাশাকে দূরে সরিয়ে রেখে, পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী মানসিক শক্তি ব্যবহার করে, মানসিক চাপকে ন্যূনতম পর্যায়ে রেখে, লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যায়। এইভাবেই সে সংগতিবিধান করে। মানসিক সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তি অবশ্যই সমাজের রীতিনীতি ও অনুশাসন মেনে চলে।

মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষায় গৃহের ভূমিকা :

(১) ইংরেজিতে বলে—'Home, Sweet home'। প্রত্যেকের গৃহ পরিবেশে পারিবারিক শান্তি বজায় থাকলে মন ভালো না থাকার অন্য কারণকেও সহজে জয় করা যায়।

(২) বাড়িতে ছোটোদের ভালোবাসার মধ্যে মানুষ করতে পারলে অনেক সমস্যাই কেটে যায়।

(৩) প্রয়োজনমতো গাইড করার জন্য অভিভাবকদের ভূমিকায় যেন স্পষ্ট চিন্তার ছাপ থাকে।

(৪) অভিভাবকরা নিজেরা আদর্শ (Role model) হয়ে উঠতে পারলে ভালো, নইলে কাউকে সামনে খাড়া করতে পারলে ভালো হয়।

(৫) পরিবারে উপযুক্ত নিরাপত্তাবোধ থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৬) অন্যের সঙ্গে তুলনা, অতিরিক্ত আদর বা শাসন বর্জন করা উচিত।

(৭) পরিবারই ছোটোদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে।

(৮) ভালো বন্ধুমহল নির্বাচনে, প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে পারিবারিক ভূমিকা অনস্বীকার্য।

(৯) বড়োদের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ছোটোদের সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে।

(১০) অতিরিক্ত ভবিষ্যৎচিন্তা অযথা টেনশন সৃষ্টি করে, তাকে এড়িয়ে চলাই ভালো।

মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষায় বিদ্যালয়ের ভূমিকা :

(১) স্কুলে শিক্ষার পরিবেশ যেন আনন্দদায়ক হয়।

(২) কোনো ধরনের বর্ণভেদ, ধর্মভেদ, জাতিভেদ, ভাষাভেদ যেন ছোটোদের মধ্যে অহেতুক বিভেদ সৃষ্টি না করে।

(৩) শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্যে যেন সুন্দর মানসিক সম্পর্ক বজায় থাকে।

(৪) নানাধরনের সহ-পাঠক্রমিক কাজ (Co-curricular activities) আয়োজন করলে তা শিশুদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সহায়ক হয়।

(৫) শিশুকেন্দ্রিক পাঠক্রম (Child centric curriculum) প্রকৃত ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে।

(৬) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মানসিক গুণ, বাচনভঙ্গি, পড়ানোর পদ্ধতি, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতা তাদের মনে এক স্থায়ী ছাপ রেখে যায়।

(৭) বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সামাজিক অবস্থান সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে।

(৮) স্কুলে নিজস্ব মত প্রকাশের নানা মাধ্যম (যেমন—বিতর্ক, ম্যাগাজিন, আলোচনা সভা) থাকলে ভবিষ্যতে আমরা উন্নত নাগরিক পেতে পারি।

(৯) পরিবার ও বিদ্যালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র থাকলে শিক্ষার্থী মনে করতে পারে যে বিদ্যালয় তার দ্বিতীয় গৃহ (Second home)।

(১০) অবসর বিনোদনের নানা সুস্থ মাধ্যমের শিক্ষা পেলে শিশু তার নিজস্ব সুপ্ত গুণ বা প্রতিভা সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে এবং ফলে ছোট্ট কুঁড়ি থেকে ভবিষ্যতে ফুটে উঠতে পারে রঙিন পাপড়ি-মেলা অপরূপ সুন্দর ফুল, যার সৌরভে সারা মানবসমাজ মাতোয়ারা হয়ে উঠতে পারে।

শিক্ষকতা পেশায় মানসিক স্বাস্থ্য :

পুরাকালে বিখ্যাত দার্শনিক ও পণ্ডিতদের হাতেই মূলত রাজপরিবার বা মুষ্টিমেয় কিছু অভিজাত পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হত। তাঁরা ছিলেন সব অর্থেই সমাজের মাথা। ধীরে ধীরে সমাজের সব স্তরেই যখন শিক্ষার চাহিদা ছড়িয়ে পড়তে লাগল, উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়াও তখন খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াল। এমন শিক্ষক যিনি একাধারে হবেন সুপণ্ডিত, সুবক্তা ও ছাত্রদরদি—শিক্ষাদানে যাঁর থাকবে অপরিসীম আগ্রহ। যিনি ছাত্রদের মানসিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন। পাঠদানের নানা আধুনিক কলাকৌশল যিনি অনায়াসে আয়ত্ত করতে পারবেন। যাঁর ব্যক্তিত্ব হবে অতুলনীয়, যিনি ছাত্রদের সমস্যায়, প্রয়োজনে সবসময়েই তাদের পাশে থাকবেন। যত দিন যেতে

Scanned with CamScanner

কোনো উপায়ই কার্যকারী হয় না, আর তাই পেশাদারি মনোবৈজ্ঞানিকের সহায়তা ছাড়া ওই কর্মীকে সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

সংগতিবিধান কী? (What is Adjustment) :

জীববিজ্ঞানীগণ মানুষের আচরণের জৈবিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন স্নায়বিক ক্রিয়ার মাধ্যমে। জৈবিক দিক থেকে আচরণের এই ব্যাখ্যা সর্বজনস্বীকৃত হলেও, মনোবিদগণ মানুষের আচরণকে একটু অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। মনোবিদগণ মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন, তার আচরণ সব সময় উদ্দেশ্যমুখী (Purposive)। এই উদ্দেশ্যমুখী আচরণের মূলে আছে তার কতকগুলি অন্তর্নিহিত চাহিদা (Need)। চাহিদার অর্থ হল অভাববোধ (feeling of want)। এ রকম চাহিদা মানুষের মধ্যে কতগুলি আছে তা বলা যায় না। কারণ, এই অভাববোধ বা চাহিদাগুলির কতকগুলি যেমন জন্মগত (Innate) আবার কতকগুলি অর্জিত। অর্থাৎ, জীবনে চলার পথে অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ চাহিদা অর্জন করে থাকে। তাই মনোবিদগণ তাদের সংখ্যা নির্ধারণের উপর গুরুত্ব না দিয়ে, তাদের মৌলিক উদ্দেশ্যভিত্তিক শ্রেণিবিভাগের পথ অনুসরণ করেছেন। তাঁরা মানুষের চাহিদাগুলিকে প্রধানত দুটি, আবার কখনও বা তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। কোনো কোনো মনোবিদ বলেছেন, মানুষের চাহিদা তার জীবনের উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে দু-ধরনের হতে পারে—জৈবিক চাহিদা (Biological need) এবং মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদা (Psychological need)। আবার কোনো কোনো মনোবিদ তাদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যগত দিক থেকে—জৈবিক চাহিদা (Organic need), মানসিক চাহিদা (Mental need) এবং সামাজিক চাহিদা (Social need)। যে মনোবিদগণ দ্বিমুখী শ্রেণিবিভাগ পছন্দ করেন, তাঁদের মতে, মানুষের মানসিক চাহিদা ও সামাজিক চাহিদাকে, একত্রে মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদা (Psychological need) বলায় কোনো তাত্ত্বিক আপত্তি থাকার কথা নয়। এখন, এইসব চাহিদাগুলির মধ্যে জৈবিক চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত করতে গিয়ে ব্যক্তি যে আচরণগুলি সম্পাদন করে, তাদের মাধ্যমে ব্যক্তির প্রাথমিক অভাববোধগুলি (ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বাসস্থান, বংশবিস্তার) দূর হয়, আর এই অভাববোধ দূর হওয়ার ফলশ্রুতি হিসাবে তার দৈহিক বিকাশ (Physical development) হয় এবং দৈহিক স্বাস্থ্য (Physical health) বজায় থাকে। অপরদিকে, মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তির সময় ব্যক্তি যে আচরণগুলি সম্পাদন করে, তার মধ্যে তার মানসিক ও সামাজিক অভাববোধগুলি দূর হয়। আর তার ফলশ্রুতি হিসাবে, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ হয় এবং মানসিক স্বাস্থ্য (Mental health) বজায় থাকে। এ সম্পর্কে মনোবিদগণ আরও বলেছেন—মানুষ তার যে-কোনো চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটায় জীবন পরিবেশের মধ্যে। প্রত্যেকটি চাহিদার সঙ্গে যুক্ত থাকে লক্ষ্য (Goal)। এই লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারলে বা, যে বস্তুর সঙ্গে অভাববোধ যুক্ত তা লাভ করলে, চাহিদা পরিতৃপ্ত হয়। সুতরাং, ব্যক্তি

তার বিশেষ কোনো চাহিদার সঙ্গে যুক্ত লক্ষ্যে (Goal) উপনীত হওয়ার জন্য পর্যায়ক্রমে আচরণ সম্পাদন করতে থাকে। আর এই প্রত্যেক পর্যায়ের আচরণের মাধ্যমে (Through behaviour), সে তার নিজস্ব চাহিদার সঙ্গে পরিবেশগত অবস্থার সামঞ্জস্যবিধান করতে থাকে। যে ব্যক্তি এই সামঞ্জস্যবিধানের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে, তার জীবনে প্রাক্ষোভিক ভারসাম্য বজায় থাকে এবং তার দৈহিক এবং মানসিক বিকাশও স্বাভাবিক সুস্থ পথে ঘটে থাকে। পরিবেশের সঙ্গে এই সামঞ্জস্যবিধানের প্রক্রিয়া ব্যক্তিজীবনে প্রতি মুহূর্তে ঘটছে। একেই বলা হয় সংগতিবিধান বা অভিযোজন (Adjustment)। বেশিরভাগ মনোবিদ সংগতিবিধানকে এইভাবে দেখেছেন। *উলম্যান্ (Wolman)* আচরণ বিজ্ঞানের অভিধানে (Dictionary of Behavioural Sciences), সংগতিবিধানের যে অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন, তাতেও চাহিদা ও পরিবেশের সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—"Adjustment is harmonious relationship with the environment involving the ability to satisfy most of one's needs and meet most of the demands both physical and social that are put upon one." অর্থাৎ, এই আভিধানিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী নিজের ব্যক্তিগত জৈবিক ও সামাজিক চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত করতে গিয়ে, ব্যক্তি পরিবেশের সঙ্গে যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুসম্পর্ক স্থাপন করে, তাকেই বলা হবে সংগতিবিধান।

সংগতিবিধানের এই আভিধানিক অর্থ, এই প্রক্রিয়ার সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে না। তাই মনোবিদগণ সংগতিবিধান প্রক্রিয়াব ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে, ব্যক্তিজীবনের আরও কতকগুলি দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেগুলি ব্যাখ্যা করলে, তবেই আমাদের পক্ষে সংগতিবিধানের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

প্রথমত, ব্যক্তির মধ্যে বহু রকমের চাহিদা থাকে। এখন ব্যক্তি যদি তার কোনো একটি বিশেষ চাহিদাকে, তা সে জৈবিক বা মানসিক যে-কোনো ধরনের চাহিদাই হোক না কেন, পরিতৃপ্ত করতে গিয়ে, তার নিজের অন্য চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করে, তবে তাকে সার্থক সংগতিবিধান বলা যাবে না। কারণ, ওই বিশেষ চাহিদাটির পরিতৃপ্তিতে তার দৈহিক ও মানসিক বিকাশে অগ্রগতি দেখা গেলেও তা কখনই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ বিশেষ ওই চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য অন্যান্য চাহিদা পরিতৃপ্তির পথ রুদ্ধ হয়েছে। ফলে ব্যক্তিগত বিকাশের পথও রুদ্ধ হয়েছে। সুতরাং, মনোবৈজ্ঞানিক অর্থে, যে-কোনো ধরনের সামঞ্জস্যবিধানের প্রক্রিয়াকে সংগতিবিধান বলা যায় না। যে সামঞ্জস্যবিধানের প্রক্রিয়া ব্যক্তির অন্যান্য চাহিদাপূরণে বাধা সৃষ্টি করে না, বা ব্যক্তির অন্তর্জগতে কোনো রকম মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে না, তাকে বলা হবে সংগতিবিধান।

দ্বিতীয়ত, মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলি ব্যক্তিগত হলেও, সে সমাজ পরিবেশে বাস করে। অর্থাৎ, সংগতিবিধান কেবল প্রাকৃতিক পরিবেশের (Physical

Scanned with CamScanner

environment) সঙ্গে করলে চলবে না, সামাজিক পরিবেশের (Social environment) সঙ্গেও করতে হবে। ব্যক্তি যদি তার কোনো চাহিদার পরিতৃপ্তি করতে গিয়ে, অন্যান্য সামাজিক মানুষের চাহিদা তৃপ্তির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে, বা সামাজিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করে, তাহলে তার সেই আচরণ সামজিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। সুতরাং, সার্থক সংগতিবিধানের প্রক্রিয়ায়, অন্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় না। অর্থাৎ, সংগতিবিধান এমন এক ধরনের সামঞ্জস্যবিধানের প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার নিজের চাহিদাগুলিকে সামাজিক মূল্যমানের সীমার (Social framework) মধ্যেই চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়। সামাজিক মূল্যমান থেকে বিচ্যুত হয়ে সামঞ্জস্যবিধান করলে তাকে সংগতিবিধান বলা যাবে না।

তৃতীয়ত, আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, চাহিদার পরিতৃপ্তি, সংগতিবিধানের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু একজন ব্যক্তি তার অন্তর্নিহিত সব রকমের চাহিদা সব সময়ে সরাসরিভাবে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। তার চাহিদা পরিতৃপ্তির পথে, বা তার চাহিদা ও লক্ষ্যের মধ্যে একটি বাধা থাকে। এই বাধাকে অতিক্রম করতে পারলেই লক্ষ্যে পৌঁছোনো সম্ভব এবং চাহিদার পরিতৃপ্তি সম্ভব। এই বাধা ব্যক্তির পক্ষে সব সময় সরাসরি অতিক্রম করা সম্ভব নাও হতে পারে। এইরূপ পরিস্থিতিতে, সংগতিবিধানের জন্য কখনও পরিবেশ বা বিশেষ অর্থে লক্ষ্যটির পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়। অথবা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূল চাহিদাটির সংবোধনের প্রয়োজন হয়। এই দুটি কাজ যে ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে, তার পক্ষে সার্থক সামঞ্জস্যবিধান করা সম্ভব। অর্থাৎ, সংগতিবিধান এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার জীবন পরিবেশের অথবা চাহিদার পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

সুতরাং, পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, মনোবৈজ্ঞানিক সংগতিবিধানের ধারণার মধ্যে অন্তত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সামঞ্জস্যবিধানের শর্ত অন্তর্ভুক্ত—(১) সংগতিবিধানের জন্য নিজের অন্যান্য চাহিদাগুলিকে এবং বিকাশকে ব্যাহত করা চলবে না ; (২) সংগতিবিধানের জন্য অন্যের চাহিদা পরিতৃপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করা চলবে না; (৩) সংগতিবিধানের জন্য পরিবেশ বা চাহিদার পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে। সুতরাং, সংগতিবিধান প্রক্রিয়ার এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রিত করে, তার সংজ্ঞা গঠন করা যেতে পারে—"যে প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তি তার কোনো চাহিদা সরাসরিভাবে বা, সংবোধনের মাধ্যমে বা পরিবেশ পরিবর্তনের মাধ্যমে চরিতার্থ করে, অথচ নিজের বা অপরের অন্যান্য চাহিদাগুলির বিনাশ ঘটায় না, সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় সংগতিবিধান। মনোবিদ *গেটস্* এবং *জারশিল্ড্ (Gates & Jersild)* অনুরূপভাবে সংগতিবিধানের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—"Not only must a person be in an environment which enables him to satisfy his basic needs satisfactorily and be able to manage his life so that satisfaction of one need does not make the satisfaction of another need impossible, but he must also satisfy his needs in such a way as to avoid interfering with fulfilment of the legitimate need of others."

সংগতিবিধানের শর্তাবলি (Conditions of Adjustment) :

ব্যক্তিজীবনের সুস্থতা নির্ভর করে সার্থক সংগতিবিধানের উপর। যে ব্যক্তি তার নিজস্ব শক্তি ও সম্ভাবনার সীমার মধ্যে জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলি মেটাতে সক্ষম হয় এবং যার ব্যক্তিগত জীবনপ্রক্রিয়া সমাজজীবনের সঙ্গে সুসংগত, তাকে সাধারণভাবে সুস্থ ব্যক্তি বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ, ব্যক্তিজীবনের সার্বিক কল্যাণ সুষ্ঠু সংগতিবিধানের উপর নির্ভর করে। তাই যেসব অবস্থা সংগতিবিধানের সহায়তা করে, সেগুলি সুস্থ জীবনযাপনেরও সহায়ক শর্ত (Condition)। যেসব অবস্থা সুষ্ঠু সংগতিবিধানে সহায়তা করে তাদেরই বলা হয় সংগতিবিধানের শর্তাবলি (Conditions of Adjustment)। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ রাখা দরকার, ব্যক্তিজীবনের সংগতিবিধানের কোনো চরম মান (Absolute Value) নেই। সংগতিবিধানের ধারণা সম্পূর্ণভাবে আপেক্ষিক (Relative)। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনোবিদগণ কতকগুলি সাধারণ শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে আমরা কয়েকটি এরকম শর্তের কথা উল্লেখ করব।

প্রথমত, সংগতিবিধানের একটি প্রধান শর্ত হল ব্যক্তির বংশগতি (Heredity)। প্রত্যেক ব্যক্তি জন্মসূত্রে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনা লাভ করে। এমনকি কিছু কিছু ব্যক্তিগত চাহিদাও বংশগতির ধারায় আসে। ব্যক্তির এই বংশগতির ধারায় প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনাগুলি পরবর্তীকালে তার পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধানের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মনোবিদ ওয়ালিন বলেছেন—মানুষ বংশগতির ধারায় সংগতিবিধানের প্রবণতা লাভ করে (Heredity supplies a predisposing condition for adjustment)। বাস্তবে বংশগতি সংগতিবিধানকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মনোবিদগণ মনে করেন ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে তার চাহিদার সামঞ্জস্য বজায় রাখা, তার দৈহিক ও মানসিক বিকাশের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। এখন, ব্যক্তির এই দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সীমা নির্ধারিত হয় বংশগতির ধারায় প্রাপ্ত সম্ভাবনা ও প্রবণতাগুলির দ্বারা। তাই বংশগতি প্রত্যক্ষভাবে বিকাশের ধারাকে প্রভাবিত করে, পরোক্ষে তার সংগতিবিধানের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। বংশগতির উপাদানগুলির দ্বারা ব্যক্তির সংগতিবিধানের যে ক্ষেত্রটি নির্ধারিত হয়, সেটির উন্নতিসাধন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, দৈহিক সুস্থতা ব্যক্তির সংগতিবিধানের আর-একটি শর্ত (Condition)। ব্যক্তির দৈহিক অবস্থার সঙ্গে তার মানসিক অবস্থার সম্পর্ক দেখা যায়। দেহ সুস্থ ও সতেজ থাকলে, মনও শান্ত ও প্রফুল্ল থাকে। তা ছাড়া, দৈহিক সুস্থতা ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস (Self-confidence) বাড়ায়। ফলে দৈহিক দিক থেকে সুস্থ ব্যক্তি যে-

Scanned with CamScanner

কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সক্রিয়ভাবে এগিয়ে যায়। অন্যদিকে, দৈহিক দিক থেকে অসুস্থ ব্যক্তি হীনমন্যতায় ভোগে, তার ফলে তার পক্ষে পরিবেশের সঙ্গে মোকাবিলা করা অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই কারণে বলা যায়—দৈহিক অবস্থা সংগতিবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

তৃতীয়ত, মানসিক স্বাস্থ্য (Mental health) ব্যক্তির সংগতিবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। যে ব্যক্তি তার মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে, তার পক্ষে পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধান করা সহজ হয়। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীরাও অবশ্য তাদের চাহিদার সঙ্গে পরিবেশের সংগতিবিধান করে থাকে। তবে তাকে সংগতিবিধান বলা হয় না ; বলা হয় অপসংগতি। কারণ, তাদের ক্ষেত্রে যে আচরণগুলি প্রকাশ পায়, তা অন্যের চাহিদা বা সামাজিক চাহিদাকে সব সময় ব্যাহত করে। অন্যদিকে মানসিক দিক থেকে সুস্থ ব্যক্তির সংগতিমূলক আচরণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে। আর ভারসাম্য বজায় রেখে সংগতিবিধান করাই ব্যক্তিজীবনের সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশের দিক থেকে কাম্য। তাই ব্যক্তির মানসিক সুস্বাস্থ্য, আদর্শ সংগতিবিধানের একটি শর্ত।

চতুর্থত, আদর্শ পারিবারিক পরিবেশ (Family environment) সংগতিবিধানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। ব্যক্তি যে পরিবারের মধ্যে বসবাস করে, সেই পরিবেশ যদি তাকে যথাযোগ্য নিরাপত্তা দান করতে সক্ষম হয়, তবে তার পক্ষে যে-কোনো পরিস্থিতিতে অভিযোজন করা সম্ভব হয়। যে পরিবারে পিতা-মাতা ও অন্যান্য সদস্যরা পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখে বসবাস করে, সেই পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি সামাজিক নিরাপত্তা (Social security) লাভ করে। অন্যদিকে, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে খারাপ সম্পর্ক থাকলে, তার প্রভাব প্রত্যেক ব্যক্তির উপর এসে পড়ে এবং প্রত্যেকেই নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। আর এই কারণে, তারা দৃঢ়তার সঙ্গে পরিবেশের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়। তাই আদর্শ পারিবারিক সম্পর্ক সুষ্ঠু সংগতিবিধানে সহায়তা করতে পারে।

পঞ্চমত, আদর্শ কর্ম পরিবেশ (Work environment), ব্যক্তির সংগতিবিধানের আর-একটি শর্ত। ব্যক্তি দিনের বেশ কিছু অংশ তার কর্ম পরিবেশের মধ্যে কাটায়। এই কর্ম পরিবেশ, অন্য সহকর্মীর সঙ্গে তার সম্পর্ক, কর্মে সন্তুষ্টি, কর্মের প্রকৃতি ইত্যাদি যদি তার ইচ্ছার অনুকূল হয়, সেক্ষেত্রে তার পক্ষে সংগতিবিধান করা অনেক সহজ হয়। কর্ম পরিস্থিতিতে যাঁরা সন্তুষ্টি পান না, তাঁরা জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই সুষ্ঠুভাবে সংগতিবিধান করতে পারেন না। তাই আদর্শ কর্মপরিবেশ, যা ব্যক্তিকে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা দেয়, তা ব্যক্তির সুষ্ঠু সংগতিবিধানে সহায়তা করে থাকে।

ষষ্ঠত, শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে, আদর্শ শিক্ষালয় পরিবেশ (School environment) সুষ্ঠু সংগতিবিধানের একটি শর্ত। শিক্ষার্থী যদি শিক্ষা পরিবেশে, যথাযোগ্য নিরাপত্তা বোধ করে এবং শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতাগুলির দ্বারা তার বিভিন্ন চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম হয়, তবে স্বাভাবিকভাবে তার সংগতিবিধানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষালয়ে জীবনযাপন করার সময়, উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমেও শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের অভিযোজন কৌশল আয়ত্ত করতে পারে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ **রেমন্ট** ***(Raymont)*** বলেছেন—"Education means the process of development in which consist the passage of human being from infancy to maturity, the process whereby he gradually adapts himself in various ways to physical, social and spiritual environment." সংক্ষেপে, তাঁর মতে শিক্ষা হল প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধানের প্রক্রিয়া। এই অর্থে শিক্ষা বা শিক্ষালয় পরিবেশ, আদর্শ সংগতিবিধানের একটি শর্ত।

ব্যক্তিজীবনের আদর্শ সংগতিবিধানের বহু শর্ত আছে। এখানে তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির কথা উল্লেখ করা হল। এখানে যে শর্তগুলির কথা আলোচনা করা হল, তার মধ্যে বংশগতিমূলক উপাদানগুলি ছাড়া বাকিগুলি নিয়ন্ত্রণযোগ্য। সুষ্ঠু সংগতিবিধানের মূল কথা হল—ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস (self-confidence)। ব্যক্তি যে পরিবেশের মধ্যেই সংগতিবিধানের চেষ্টা করুক না কেন, সে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে যদি ব্যক্তির মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করা যায়, তা হলে তার পক্ষে সেই কাজ অনেক সহজ হয়।

সুষ্ঠু সংগতিবিধানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of good Adjustment) :

আমরা এ পর্যন্ত সংগতিবিধান সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি, তাতে সংগতিবিধানকে এক ধরনের প্রক্রিয়া (Process) হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি নিজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। যে-কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তির সক্রিয়তা কিছু ফলপ্রাপ্তিতে সহায়তা করে। যেমন, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সক্রিয়তা দেখা যায়, তার ফলে তাদের সমস্যাসমাধানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তবে সকল শিক্ষার্থীর সমস্যাসমাধান প্রক্রিয়ার গুণগত মান সমান নাও হতে পারে—কারও ভালো, কারও মাঝারি ধরনের, কারও খারাপ। ঠিক একইভাবে ব্যক্তি যখন পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধানে অগ্রসর হচ্ছে, তখন তার সংগতিবিধানেরও গুণগত মান থাকা স্বাভাবিক। যদিও এ কথা ঠিক যে, এই গুণগত মানের চরম অবস্থা কী, তা মনোবিদদের জানা নেই, তবুও কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তাঁরা এই সংগতিবিধানের মান নির্ণয় করে থাকেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্যই আচরণগত। অর্থাৎ, এই দিক থেকে ব্যক্তির সংগতিবিধানকে তার পারদর্শিতা (Achievement) হিসাবেও ভাবা হয়। যে ব্যক্তি সংগতিবিধানে পারদর্শিতা প্রদর্শন করে তাকে বলা হয় **স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী,** আর এই পারদর্শিতা যার কম তাকে বলা

Scanned with CamScanner

হয় **অস্বাভাবিক**। যে বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে এই সংগতিবিধানের পারদর্শিতার মান নির্ধারণ করা হয়, সেগুলি হল—

(১) যে ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধানে সক্ষম হয়েছে, তার মধ্যে কোনো-রকম মানসিক অস্থিরতার (Mental discomfort) লক্ষণ দেখা যায় না। ব্যক্তির সাধারণ মানসিক অস্থিরতার লক্ষণ তার কতকগুলি সাধারণ আচরণ থেকে লক্ষ করা যায়। যেমন—**অত্যধিক বিমর্ষভাব** (Depression), **অহেতুক আশঙ্কা** (Anxiety), **অহেতুক ভয়** (Unnecessary fear), **ভ্রান্ত বিশ্বাস** (delusion), **আবেশিক বায়ু** (obsession) ইত্যাদি। সুতরাং, যে ব্যক্তি সুষ্ঠু সংগতিস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে, তার আচরণের মধ্যে সদা প্রফুল্লভাব থাকবে, অহেতুক কোনো ব্যাপারে আশঙ্কা বা ভয় থাকবে না, ভ্রান্তবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ করবে না এবং ব্যক্তিগত আচরণের উপর তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লক্ষ করা যাবে।

(২) যে ব্যক্তি পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে সংগতিবিধান করতে সক্ষম হয়েছে, সে যে-কোনো পরিস্থিতিতে কাজ করতে গিয়ে, তার পূর্ণ সামর্থ্য প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার **সামাজিক উপযোগিতা** (Social usefulness), তার কর্মদক্ষতার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে সক্ষম, তাকেই সুস্থ সংগতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বলা যাবে।

(৩) যে ব্যক্তিকে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিরা পছন্দ করে, যার সান্নিধ্যে থাকতে সকলে ভালোবাসে, সে ব্যক্তি তার জীবনে যথাযথভাবে সংগতিবিধান করতে সক্ষম হয়েছে, এ কথা বলা যায়। অর্থাৎ, যে ব্যক্তির সুষ্ঠু সামাজিক বিকাশ হয়েছে, যিনি সমাজের অন্তর্গত সকল ব্যক্তির সঙ্গে যথাযোগ্য সম্পর্ক স্থাপন করে, অবাধ মেলামেশা করতে পারেন, তিনি অবশ্যই তাঁর জীবন পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে অভিযোজন করতে সক্ষম হয়েছেন। এই সামাজিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে তাঁর সংগতিবিধানের স্তর সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

(৪) মনোবিদগণ বলেছেন, ব্যক্তির সংগতিবিধানের মাত্রা, অনেক সময় তার দৈহিক অবস্থা থেকে বোঝা যায়। মনশ্চিকিৎসকগণ তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন, অনেক সময় ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্যের অভাবের দরুন, সে দৈহিক দিক থেকে অসুস্থ হয়েছে ; এমনকি দেহের কোষগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে ব্যক্তি কোনো রকম, জৈবিক যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়াই নানা ধরনের অসুস্থতার কথা প্রায়ই বলে, সে যথার্থভাবে জীবন পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধান করতে অসমর্থ হয়েছে। তাই যে ব্যক্তির মধ্যে অকারণ কোনো দৈহিক উপসর্গ (Physical symptom) দেখা যায় না, বুঝতে হবে, তিনি যথার্থ সংগতিবিধান করতে সক্ষম হয়েছেন।

(৫) যে ব্যক্তি ব্যতিক্রমী কোনো আচরণ করে না, তার ক্ষেত্রে সংগতিবিধানের কোনো সমস্যা নেই বুঝতে হবে। ব্যক্তি পরিবেশে তার আচরণের মাধ্যমে সংগতিবিধান করে থাকে। যখন, সে স্বাভাবিক আচরণের দ্বারা পরিবেশ এবং তার ব্যক্তিগত চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করতে ব্যর্থ হয়, তখনই সে ব্যতিক্রমী বা অস্বাভাবিক আচরণ সম্পাদন করে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করে। তাই অস্বাভাবিক আচরণ বা কোনো ব্যতিক্রমী আচরণ ব্যক্তির অপসংগতির পরিচায়ক। সুতরাং, বিপরীতক্রমে বলা যায়, যে ব্যক্তি, পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে সংগতিবিধান করতে সক্ষম হয়েছে, তার মধ্যে অপসংগতিমূলক আচরণ বা কোনো অস্বাভাবিক আচরণ দেখা যায় না।

(৬) মানসিক অস্থিরতা, মনঃসংযোগের অভাব, বিকৃত চিন্তন, ব্যাহত চিন্তন ইত্যাদির মতো উপসর্গগুলি ব্যক্তির মানসিক ক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষমতাকে হ্রাস করে। অন্যদিকে এইসব বৈশিষ্ট্যগুলি, ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়, যখন ব্যক্তি তার চাহিদাকে পরিবেশের মধ্যে পরিতৃপ্ত করতে ব্যর্থ হয় বা সার্থক সংগতিবিধানে ব্যর্থ হয়। তাই **মানসিক কর্মক্ষমতার** (efficiency for mental work) হ্রাস আদর্শ সংগতিবিধানের লক্ষণ নয়। যে ব্যক্তি সার্থকভাবে পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধানে সক্ষম হয়েছে, সে পরিপূর্ণ মানসিক কর্মক্ষমতারও অধিকারী হবে।

(৭) উপযুক্ত **প্রাক্ষোভিক ভারসাম্য** (Emotional balance) বজায় রাখা, আদর্শ সংগতিবিধানের লক্ষণ। মানুষ তার **অনুভূতি** (Feeling) এবং **প্রক্ষোভগুলিকে** (emotions) আচরণের মধ্যে প্রকাশ করে। এইসব **প্রাক্ষোভিক আচরণ** (Emotional behaviour) প্রকাশ করার কিছু সমাজসম্মত আদর্শরীতি আছে। ব্যক্তির প্রাক্ষোভিক আচরণগুলি যখন সেই আদর্শরীতি থেকে বিচ্যুত হয়, তখন বুঝতে হবে, সে পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে সংগতিবিধানে ব্যর্থ হয়েছে। অর্থাৎ, খুব তীব্রভাবে প্রাক্ষোভিক অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করা বা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা আদর্শ ব্যক্তিসত্তার লক্ষণ নয়। যে ব্যক্তির জীবনে সংগতিবিধানের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে, সে জীবনের যে-কোনো পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে।

সংগতিবিধান বা অভিযোজনের কৌশল ঃ

হতাশা থেকে মুক্তি পাওয়া, বাধাকে অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌঁছোনো এবং চাহিদার পরিতৃপ্তি ইত্যাদিকে অভিযোজনের কৌশল বলা হয়। ব্যক্তিত্বে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি কোনো-না-কোনো কৌশল অবলম্বন করে থাকে।

অভিযোজন সাধারণ প্রক্রিয়া—

(ক) সাধারণ অস্বীকার ঃ যা বিপদের কারণ তাকে অস্বীকার করা।

Scanned with CamScanner

(খ) আক্রমণাত্মক মনোভাব : যা কিছু হতাশা তৈরি করে তাকে ধ্বংস করা। হতাশার উৎস যদি বাইরের কোনো বিষয় বা বস্তু অথবা ব্যক্তি হয়, তখন তাকে আক্রমণ করা। যদি ব্যক্তি নিজেকেই হতাশার উৎস মনে করে, তাহলে নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করা।

(গ) পরিপূরণ : কোনো একটি দিকে ঘাটতি থাকলে, অন্যদিকে ওই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা।

(ঘ) উন্নীতকরণ : মনোবিদ *আলপোর্টের* মতে, উন্নীতকরণ হল একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে অসামাজিক আচরণগুলি সামাজিক সমর্থনযোগ্য হয়ে ওঠে।

(ঙ) অভেদীকরণ : নিজেকে অপর কোনো ব্যক্তি বা দলের সঙ্গে একাত্মবোধ করা।

(চ) প্রতিক্ষেপণ : নিজের ভুলভ্রান্তি অপরের উপর চাপিয়ে দেওয়া।

(ছ) অপব্যাখ্যান : আচরণের প্রকৃত যুক্তি না দেখিয়ে যখন ভ্রান্ত যুক্তি দেখিয়ে ব্যক্তি তার আচরণের ব্যাখ্যা করে।

(জ) অবদমন : ব্যক্তির যেসব অভিজ্ঞতা এবং চিন্তাধারার সামাজিক স্বীকৃতি নেই, সেগুলোর জন্য তার মনে অপরাধবোধের সৃষ্টি হয় এবং ওইগুলিকে মনের অবচেতন অংশে পাঠিয়ে দেয়—একেই অবদমন বলে।

(ঝ) প্রতিক্রিয়া সংগঠন : ব্যক্তি তার অসামাজিক ইচ্ছাকে গোপন করার জন্য যখন সে ওই ইচ্ছার বিপরীত মনোভাব প্রকাশ করে তখন তাকে প্রতিক্রিয়া সংগঠন বলে।

(ঞ) নেতি মনোভাব : এটি একটি কৌশল যার দ্বারা ব্যক্তি অন্যান্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আংশিকভাবে এটি প্রতিরক্ষা কৌশল, আংশিকভাবে এটি পলায়নী কৌশল।

(ট) অলীক কল্পনা : দৈনন্দিন জীবনে ব্যক্তি ব্যর্থতার সম্মুখীন হলে অবাস্তব কল্পনার দ্বারা অতৃপ্ত ইচ্ছার পরিতৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করে।

(ঠ) প্রত্যাবৃত্তি : অবচেতনভাবে পিছিয়ে যাওয়া। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যখন চাহিদা পরিপূরণে ব্যর্থ হয়, তখন সে শিশু বা অল্পবয়স্কদের মতো আচরণ করে।

সংগতিবিধান (Adjustment) কথাটির অর্থ মানিয়ে চলা। আমাদের চারপাশের পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী যখন আমরা যথাযথ আচরণ করি, তখন সেই প্রক্রিয়াকে সংগতিবিধান বলা হয়। ব্যক্তির সুষ্ঠু জীবনযাপন, জীবনে সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠালাভ, পারিবারিক সম্প্রীতি, বন্ধু-প্রতিবেশী মহলে প্রাপ্ত মর্যাদালাভ, বৃত্তিতে সাফল্য এবং সবশেষে আত্মতৃপ্তি এ সবই নির্ভর করে পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু ও সার্থক সংগতিবিধানের উপর।

কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সংগতিবিধান করতে পারে না এবং তার ফলে সে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোতে সক্ষম হয় না।

ব্যক্তি যাতে তার পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সংগতিবিধান করতে পারে তার জন্য কতকগুলি পন্থা অবলম্বন করা দরকার :

(ক) শারীরিক সুস্থতা : ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধান করে কেবল মানসিক প্রচেষ্টার দ্বারা নয়, তার শারীরিক প্রয়াসও এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ, ব্যক্তি তার দেহ ও মন বা সম্পূর্ণ অস্তিত্ব দিয়ে পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধান করে। এককথায় সুষ্ঠু সংগতিবিধানের জন্য শারীরিক সুস্থতা একটি অপরিহার্য উপকরণ। সাময়িক অসুস্থতার জন্যও ব্যক্তির মেজাজ খারাপ থাকতে পারে এবং তার ফলেও তার সংগতিবিধানের প্রচেষ্টা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

(খ) আত্মবিশ্লেষণ : দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ জটিল সমস্যাবলির সঙ্গে সংগতিবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল আত্মবিশ্লেষণ। যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন, আচরণ বৈশিষ্ট্য ও সেই সঙ্গে নিজের শক্তি-সামর্থ্যকে বিশ্লেষণ করে সেগুলির প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ণভাবে অবহিত হয়, তার পক্ষে পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধান করা সহজ হয়। প্রথমে ব্যক্তি তার জীবনের মুখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলি ভালো করে জানবে। তারপর তার নিজের শক্তি-সামর্থ্যের প্রকৃত মূল্যায়ন করবে। অবশেষে তার শক্তি ও সামর্থ্যের সঙ্গে তার চাহিদা ও লক্ষ্যগুলির একটা সুষম সামঞ্জস্যবিধান করতে হবে। অ্যাড্‌লার, তার মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বে ব্যক্তির জীবনধারা এবং তার নিজের চাহিদা ও লক্ষ্যের মধ্যে সংগতিবিধান করাকে সুষ্ঠু ব্যক্তিসত্তা গঠন এবং মানসিক সাম্য অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সোপান বলে বর্ণনা করেছেন।

আত্মবিশ্লেষণ থেকে আসে নিজেকে মেনে নেওয়া। যখন ব্যক্তি নিজের সামর্থ্য এবং সেই সঙ্গে নিজের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে, তখনই নিজেকে তার প্রকৃত স্বরূপে মেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়।

(গ) বাস্তবকে মেনে নেওয়া : নিজেকে মেনে নেওয়ার পরবর্তী অপরিহার্য স্তরটি হল বাস্তবকে মেনে নেওয়া। ব্যক্তি তার পরিবারের এবং তার চারপাশের পরিবেশের সদস্যদের পর্যবেক্ষণ করবে, জানবে এবং তাদের মেনে নেবে। তাহলে তাদেরকে ঘিরে অবাস্তব প্রত্যাশা থাকবে না। ব্যক্তিকে তার প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবকেও ভালো করে জানতে হবে। ফলে ব্যক্তির পক্ষে প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সংগতিবিধান অনেক বেশি সহজ ও সন্তোষজনক হবে।

(ঘ) অন্তরঙ্গ ও আস্থাভাজন ব্যক্তি : সুষ্ঠু সংগতিবিধান করা এবং প্রক্ষোভমূলক সাম্য বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই এমন কেউ অন্তরঙ্গ ও আস্থাভাজন ব্যক্তি থাকবে যার কাছে সে তার মনের কথা খুলে বলতে পারবে। বস্তুত মন খুলে কথা

Scanned with CamScanner

(ছ) মানিয়ে চলতে না পারা।

(জ) প্রাক্ষোভিক অসামঞ্জস্যবিধান।

(ঝ) হজমের গণ্ডগোল।

(ঞ) রক্তে উচ্চচাপ।

মানসিক চাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায় ঃ

- *(ক) অবাস্তব প্রত্যাশা ঃ* অবাস্তব প্রত্যাশা নিয়ে নিজের জীবনকে ভারাক্রান্ত করা উচিত নয়। এটা ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে পারে। নিজের প্রত্যাশাগুলো যাচাই করে দেখার প্রয়োজন আছে। জীবনের লক্ষ্য স্থির করে সেইমতো এগোনো যেতে পারে।

- *(খ) অহেতুক সময়সীমা ঃ* অহেতুক সময়সীমা নির্ধারণ করে কাজের চাপ বাড়ানো ঠিক নয়। দৈনন্দিন জীবনে কাজের যা ছন্দ তাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করা দরকার। সময়সীমা নির্ধারণ করে কাজ করা ভালো, তবে যদি সেটা চাপ সৃষ্টি না করে।

- *(গ) সমস্যাকে বুঝতে শেখা ঃ* সমস্যাকে না এড়িয়ে বুঝতে শেখা দরকার। জীবনে সবাইকে কখনোই খুশি করা যায় না। তাই অযথা সবার কাছে প্রিয় হবার জন্য, তাদের চাহিদা মেটানোর জন্য নিজের সমস্যা বাড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই। অন্যকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসা নিশ্চয়ই মানবিকতার পরিচয়, কিন্তু সেটা নিজের ক্ষমতাকে অতিক্রম করে অবশ্যই নয়।

- *(ঘ) স্বনির্ভরতা ঃ* স্বনির্ভরতার মধ্য দিয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠা দরকার। স্বনির্ভর হলে কাজ করে আনন্দ পাওয়া যায়।

- *(ঙ) কাজের গতি ঃ* সঠিক সময়ে কাজের ইতি না টানলে কাজ কখনই শেষ হবে না এবং যে কাজে আনন্দ পাবার কথা সেটা ক্রমশই অবসাদ তৈরি করবে।

- *(চ) পারিবারিক জীবন উপভোগ ঃ* কাজের চিন্তা বাড়িতে না এনে নিজের পারিবারিক জীবন উপভোগ করা দরকার। এ ছাড়া গান, বাজনা, আঁকা, খেলা, সাঁতার এগুলোর মধ্যে কিছুক্ষণ অন্তত নিজেকে নিয়োজিত করলে মানসিক চাপ লাঘব করা যাবে।

- *(ছ) শ্রোতা এবং দর্শকের ভূমিকা ঃ* মানসিক অবসাদে শ্রোতা এবং দর্শকের ভূমিকা নেওয়া দরকার। মানসিক চাপে থাকলে অন্যরা কী বলছে তা বুঝতে সময় লাগে, তাই চুপ করে অন্যের কথা শুনলে মানসিক চাপ কম অনুভূত হয়।

Scanned with CamScanner

3 অপসংগতি ও তার কারণ (Causes of Maladjustment)

অপসংগতির কারণ—ব্যক্তিগত কারণ—সামাজিক কারণ—শিক্ষাসংক্রান্ত কারণ।

অপসংগতি ও তার কারণ (Causes of Maladjustment) ঃ

আমরা জানি, ব্যক্তি যখন তার চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধান করতে পারে, তখন তার প্রাক্ষোভিক ভারসাম্য বজায় থাকে এবং তার মানসিক সংগঠনের বিকাশ হয়। আর, এই ধরনের সংগতিবিধানের জন্য কখনও পরিবেশের পরিবর্তন করা প্রয়োগ হয়ে পড়ে, আবার কখনও বা নিজের চাহিদার সংশোধন করতে হয়। এইভাবে ব্যক্তি তার নিজের চাহিদাগুলিকে সার্থকভাবে পরিতৃপ্ত করতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি জীবনের প্রাথমিক চাহিদাগুলিকে পরিতৃপ্ত করতে ব্যর্থ হয়, তার মধ্যে প্রাক্ষোভিক অসাম্যাবস্থা দেখা যায়। তার মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্বেরও সৃষ্টি হয়। এই অবস্থাকে বলা হয় অপসংগতি।

অপসংগতি ব্যক্তিজীবনের একটি জটিল সমস্যা। অপসংগতির কারণ হিসাবে কয়েকটি উৎসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই উৎসগুলি নিঃসন্দেহে জীবনের চাপ বা পরিবেশের চাপ যে কারণে অপসংগতি ঘটছে, সেই কারণগুলি মূলত ব্যক্তিগত, সামাজিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত।

অপসংগতি ব্যক্তিজীবনে একটি জটিল সমস্যা। ব্যক্তিজীবনে যে সুষ্ঠু সংগতিবিধান হয় তা তার আচরণ দেখে বোঝা যায়। তবে শুধুমাত্র আচরণ পর্যবেক্ষণ করে, ব্যক্তির অপসংগতি বিচার করা যায় না, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ব্যক্তি সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়ার প্রত্যাশায়, তার আচরণকে অনেক সময় অন্যের সামনে প্রকাশ করে না। সেক্ষত্রে ব্যক্তির বহিরাচরণ দেখে অপসংগতি সম্বন্ধে ধারণা করা মুশকিল হয়ে পড়ে। মনোবিদগণ অপসংগতি নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা প্রস্তুত করেছেন, যেগুলি ব্যবহার করে অপসংগতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। রোজার্স (Rogers)-এর 'পারসন্যালিটি এ্যাডজাস্টমেন্ট টেস্ট' (Personality adjustment test), বেল (Bell)-এর 'অ্যাডজাস্টমেন্ট ইনভেন্টরি' (Adjustment Inventory), টেলর (Taylor)-এর 'অ্যাংজাইটি স্কেল' (Anxiety scale) ইত্যাদির দ্বারা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যক্তির অপসংগতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তবে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অপসংগতি নির্ণয় করার জন্য সব সময় এই জাতীয় অভীক্ষা ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের আচরণগুলি পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের প্রাক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ার

রীতি পর্যবেক্ষণ করে, অপসংগতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পেতে পারেন। যেমন সাধারণ আচরণের মধ্যে তোতলামি, প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় মাথা চুলকানো, নখ কামড়ানো, অযথা মুখ বিকৃত করা, বেঞ্চে তবলা বাজানো ইত্যাদি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসংগতির লক্ষণ। আবার, এগুলির চেয়ে বেশি সক্রিয় আচরণের মধ্যে, আক্রমণাত্মকভাব, মিথ্যা কথা বলা, অন্যের জিনিস চুরি করা, অত্যধিক অনুযোগ করার প্রবণতা, সবকিছুতে নেতিবাচক মনোভাব ইত্যাদিও অপসংগতির নির্দেশক। প্রাক্ষোভিক আচরণের দিক থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অত্যধিক আশঙ্কা, অহেতুক ভয়, ঘৃণা, লাজুক ভাব, মানসিক দ্বন্দ্ব, বিমর্ষতা ইত্যাদি অপসংগতির লক্ষণ। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই ধরনের অপসংগতিমূলক আচরণ (Maladjusted behaviour) কেন সৃষ্টি হয়, বা তাদের সংগতিবিধানে কেন অসুবিধা হয়, তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে শিক্ষাবিদ ও মনোবিদগণ কতকগুলি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা কেবল সেই কারণগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসংগতির কারণগুলি সংখ্যায় বহু। আমরা এখানে তাদের মধ্যে সাধারণ কতকগুলির কথা উল্লেখ করব। শিক্ষাবিদ ও মনোবিদগণ অপসংগতির কারণ হিসাবে তার কয়েকটি উৎসের (source) কথা উল্লেখ করেছেন। এই উৎসের ভিত্তিতে কারণগুলি কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন—ব্যক্তিগত কারণ (Personal Cause), সামাজিক কারণ (Social Cause) এবং শিক্ষাসংক্রান্ত কারণ (Educational Cause)।

ব্যক্তিগত কারণ (Personal Cause) ঃ

অপসংগতির জন্য অনেক সময় শিক্ষার্থীর নিজস্ব কিছু ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য দায়ী হয়ে থাকে। অবশ্য এই বৈশিষ্ট্যগুলিই অপসংগতি সৃষ্টি করে এ কথা বলা যায় না। তবে ওইসব বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি সাধারণ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির দরুন শিক্ষার্থীর মধ্যে অপসংগতি ঘটে থাকে। অর্থাৎ, যে বৈশিষ্ট্যগুলি, সামাজিক সাধারণ মানসিকতার দরুন তার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং অপসংগতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সেগুলিকে বলা হয় অপসংগতির ব্যক্তিগত কারণ (Personal Causes of Maladjustment) যেমন—

● (১) শিক্ষার্থীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য অনেক সময় তার অপসংগতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন যে শিক্ষার্থী সুশ্রী নয়, দুর্বল বা যার কোনো দৈহিক ত্রুটি (Physical defect) আছে তাকে সবাই করুণার চোখে দেখে। তার প্রতি সাধারণের এই দৃষ্টিভঙ্গি তার মনে হীনম্মন্যতাবোধ সঞ্চার করে। এর ফলে ধীরে ধীরে তার মধ্যে অপসংগতি দেখা দেয়; নিজেকে সকলের সামনে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে প্রমাণ করার জন্য নানাধরনের অপসংগতিমূলক আচরণে (Maladjusted behaviour) প্রবৃত্ত হয়।

Scanned with CamScanner

● (২) যেসব শিক্ষার্থী দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকে (Long Sickness) বা পুনঃপুন অসুস্থে ভোগে, তাদের ক্ষেত্রে অপসংগতি দেখা যায়। অর্থাৎ, দীর্ঘ সময়ের অসুস্থতা শিক্ষার্থীর অপসংগতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার ফলে, শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত পারদর্শিতার মান নেমে যায় ; সে তার দল থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। ফলে, তার বর্তমান শিক্ষাগত মান অনুযায়ী অন্য দলের মধ্যে মেলামেশা করতে বাধ্য হয়। নিজের দলের সঙ্গে সে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে ব্যর্থ হয়। আর এর ফলে, তার মধ্যে নানারকমের অপসংগতিমূলক আচরণ দেখা দেয়।

● (৩) শিক্ষার্থীরা অনেক সময়, তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের অভাবের দরুন, অপসংগতির শিকার হয়। অনেক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা তাদের জীবনের লক্ষ্য (Goal of life) এমন উন্নত স্তরে স্থাপন করেছে, যে তাদের দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার দ্বারা তা কখনোই অর্জন করা সম্ভব নয়। নিজেদের সম্পর্কে এই ভুল মূল্যায়নের জন্য, তারা স্বাভাবিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে অকৃতকার্য হয়। আর এই অকৃতকার্যতাকে বা ব্যক্তিগত ত্রুটিকে অন্যান্য সকলের থেকে আড়াল করার জন্য তারা নানাধরনের অপসংগতিমূলক আচরণ করে থাকে। অর্থাৎ এই ধরনের অপসংগতির মূলে আছে, প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত গুণের অভাব এবং নিজের ক্ষমতাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার অক্ষমতা।

● (৪) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত মানসিক দুর্বলতার দরুন অনেক সময় অপসংগতি ঘটে। যে শিক্ষার্থীরা মানসিক দিকে থেকে দুর্বল, তারা কোনো **প্রাক্ষোভিক আঘাত** (Emotional shock) সহ্য করতে পারে না। পিতা-মাতার হঠাৎ মৃত্যু, বন্যা-ঝড় ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদির মতো আকস্মিক ঘটনা, মানসিক দিক থেকে দুর্বল শিক্ষার্থীদের **মানসিক সংগঠনকে (Mental structure)** আলোড়িত করে। সেই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, তারা কতকগুলি আচরণ করে যেগুলিকে স্বাভাবিক বলা যায় না। যারা মানসিক দিক থেকে দৃঢ় প্রকৃতির তারা এই অবস্থা থেকে সহজে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। কিন্তু দুর্বল চিত্তের শিক্ষার্থীদের পক্ষে তা সম্ভব হয় না।

সুতরাং, যে-কোনো ধরনের ব্যক্তিগত প্রাক্ষোভিক আঘাত তাদেরকে স্থায়ীভাবে অপসংগতির দিকে ঠেলে দেয়। অপসংগতির যে কারণগুলির কথা উল্লেখ করা হল, সেগুলি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে শিক্ষার্থীর নিজের কোনো হাত নেই। তার ব্যক্তিগত এই বৈশিষ্ট্যগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জন্মগত। কিন্তু উপযুক্ত নির্দেশনা ও পরামর্শদানের মাধ্যমে এইসব কারণ দ্বারা সৃষ্ট অপসংগতিকে দূর করা যেতে পারে। উপযুক্ত পরামর্শদান করে (Counselling) যদি শিক্ষার্থীকে তার ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া যায় এবং তার ভিত্তিতে তাকে নিজের জীবনাদর্শ নির্ধারণ করতে সহায়তা করা যায়, তা হলে এই কারণের জন্য অপসংগতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাকে দূর করা

যায়। এই কারণে, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রথম থেকে নিয়মিত পরামর্শদানের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

সামাজিক কারণ (Social Cause) :

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসংগতি সামাজিক কারণেও ঘটতে পারে। সাধারণ জীবনে ব্যক্তির বেশিরভাগ অপসংগতি এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির দরুন ঘটে থাকে। সমাজের যে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা এবং রীতিনীতির জন্য ব্যক্তিজীবনে অপসংগতি দেখা দেয়, সেগুলিকে আমরা অপসংগতির সামাজিক কারণ (Social causes of maladjustment) বলতে পারি। এই সামাজিক কারণগুলি দুটি দিক থেকে আসতে পারে—(ক) বৃহত্তর সমাজ থেকে অথবা (খ) সামাজিক সংস্থা হিসাবে, গৃহ-পরিবেশ বা পরিবার থেকে। বৃহত্তর সমাজের যেসব পরিস্থিতির দরুন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসংগতি দেখা দেয়, তাদের বলা যায় **সাধারণ সামাজিক কারণ** (General social causes of maladjustment) এবং পরিবার বা গৃহ-পরিবেশের যেসব পরিস্থিতি শিক্ষার্থীর মধ্যে অপসংগতি সৃষ্টি করে সেগুলিকে বলা হয় পারিবারিক পরিবেশগত কারণ (Family causes of maladjustment)।

অপসংগতির সাধারণ সামাজিক কারণগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল—

● (১) ধর্মীয় বিশ্বাস (Religious belief) অনেক সময় শিক্ষার্থীর মধ্যে অপসংগতি সৃষ্টি করে। বহুধর্ম প্রচলিত সমাজে, বিভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং নিজেদের ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। প্রত্যেক শিশুর জন্ম মুহূর্তেই ধর্মীয় দীক্ষা হয়ে যায়। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ও শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু বা শিক্ষার্থী ধর্মীয় সংস্কারগুলি সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন তোলে, যার সমাধান সে খুঁজে পায় না এবং ওই ধর্মীয় বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতেও পারে না। এর ফলে যে মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তার ফলশ্রুতি হিসাবে অপসংগতিমূলক আচরণ দেখা দেয়।

● (২) সমাজের মধ্যে আর্থিক ভিত্তিতেই হোক বা কর্মভিত্তিতে হোক, মানুষের স্তর বিভেদীকরণের (Status differentiation) প্রক্রিয়া ঘটে থাকে। সংস্কারযুক্ত গতানুগতিক সমাজই হোক বা আধুনিক সংস্কারমুক্ত সমাজই হউক, আর্থসামাজিক স্তরবিন্যাস সমাজের স্বাভাবিক নিয়ম। এই স্তরবিন্যাস থেকে সামাজিক সুযোগ-সুবিধার অসম বণ্টন শুরু হয়। এক শ্রেণির মানুষ সমাজে বেশি সুযোগ-সুবিধা পায় ; আর-এক শ্রেণি অবহেলিত হয়। এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে শিক্ষার্থীদের যুক্তিবাদী মনে নানা রকম প্রশ্ন জাগে, যেগুলির উত্তর সে বয়স্কদের কাছ থেকে পায় না। আর এই কারণে তার পক্ষে সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সংগতিবিধান অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই সমস্যাসমাধানের জন্য তারা অস্বাভাবিক আচরণে লিপ্ত হয়।

Scanned with CamScanner

● (৩) আবদ্ধ গতানুগতিক সমাজে, কন্যাসন্তান ও পুত্রসন্তানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এমনকি বয়স্ক নারী ও পুরুষের সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে পার্থক্য করা হয়। ভারতীয় সমাজে নারী বা মেয়ে-সন্তানদের অবহেলার চোখে দেখা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি প্রতিবাদ হিসাবে শিক্ষার্থীরা অপসংগতিমূলক আচরণ করে থাকে। অর্থাৎ, এই সামাজিক রীতির সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে ব্যর্থ হয়। বিশেষভাবে ছাত্রীদের মধ্যে এই লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক পার্থক্যকরণের প্রথার জন্য অপসংগতি দেখা দিয়ে থাকে।

● (৪) সমাজের মধ্যে আমোদ-প্রমোদ ব্যবস্থার অভাব বা উপযুক্ত অবসর যাপনের সুযোগসুবিধার অভাবের দরুন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসংগতি দেখা দেয়। অল্পবয়সের শিক্ষার্থীরা একই ধরনের পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ করা অপছন্দ করে। তা ছাড়া অবসর যাপনের জন্য তারা আমোদ-প্রমোদমূলক কাজ বেশি পছন্দ করে। তারা লক্ষ করে, তাদের কাজের মধ্যে বৈচিত্র্য আনার বা তাদের জন্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সমাজ গ্রহণ করছে না। এর ফলে তারা সমাজের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে শুরু করে। আর ধীরে ধীরে সামগ্রিকভাবে সমাজ পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে তারা ব্যর্থ হয়। এমনিভাবে শিশু বা শিক্ষার্থীদের চাহিদার প্রতি সমাজের উদাসীনতা, তাদের মধ্যে অপসংগতির সূচনা করে।

● (৫) শিক্ষার্থীরা, বিশেষভাবে কৈশোরের শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে সচেতন হয়। তারা তাদের ভবিষ্যৎ **আর্থিক নিরাপত্তার** (Economic security) এবং **আর্থিক স্বয়ম্ভরতার** কথা বিশেষভাবে চিন্তা করে। কিন্তু, বাস্তব পরিস্থিতিতে তারা যখন দেখে যে সমাজের মধ্যে নিজের আর্থিক সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করার মতো ব্যবস্থা নেই, তখন তারা হতাশায় (frustration) ভুগতে শুরু করে। এর ফলে তাদের মধ্যে অপসংগতি দেখা দেয়। অর্থাৎ, সমাজের মধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগসুবিধার অভাব, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসংগতির একটি কারণ।

● (৬) সমাজে বয়স্ক ব্যক্তিদের অযৌক্তিক আচরণ শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু সংগতিবিধানের প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করে। আর্থসামাজিক নিরাপত্তার অভাবজনিত ভয়ে, তারা সাময়িকভাবে, বয়স্কদের নির্দেশ মান্য করলেও, অবচেতনে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-স্পৃহা পোষণ করতে থাকে। আর এই অবদমিত প্রতিবাদ অস্বাভাবিক আকারে, তাদের আচরণের মধ্যে সুযোগ পেলেই প্রকাশ করে থাকে। এইভাবে, বয়স্কদের অযৌক্তিক আচরণের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসংগতি দেখা দেয়।

পূর্বোক্ত সাধারণ সামাজিক কারণগুলি ছাড়াও পরিবারের কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসংগতি দেখা দেয়। পরিবার (Family) সমাজেরই একটি সংস্থা। তাই অপসংগতির সব রকম সাধারণ সামাজিক কারণগুলি পরিবারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু, সামাজিক

সংস্থা হিসাবে, পরিবারের নিজস্ব কিছু বিশেষ দায়িত্ব আছে। পরিবার সেই বিশেষ দায়িত্বগুলি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে না পারলে, শিশু বা শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপসংগতি দেখা দেয়। এখানে, আমরা এরকম কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ সম্পর্কে আলোচনা করব—

● (১) **পারিবারিক আর্থিক অসংগতি বা দারিদ্র্য** শিক্ষার্থীদের অপসংগতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, অপসংগতির সঙ্গে আর্থিক অসংগতির ধনাত্মক সম্পর্ক (Positive correlation) বর্তমান। বেশিরভাগ অপসংগতিসম্পন্ন শিক্ষার্থী, অসচ্ছল পরিবার থেকে আসে। গরিব পিতা-মাতারা স্বাভাবিক কারণে, তাঁদের সন্তানদের সব রকম চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে পারেন না। আর এইসব চাহিদা পরিতৃপ্ত না হওয়ার দরুন, শিশুর বা শিক্ষার্থীর মনে হতাশার সঞ্চার হয়। এই হতাশারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে অপসংগতিমূলক আচরণের মধ্যে। তারা মিথ্যা কথা বলে, অন্যের জিনিস চুরি করে।

● (২) **পিতা-মাতার উপযুক্ত শিক্ষার অভাব**, অনেক সময় শিশুর বা শিক্ষার্থীর অপসংগতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষার ব্যাপারে, তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে, পিতামাতার প্রত্যক্ষ সাহায্য প্রত্যাশা করে। কিন্তু, পিতা-মাতার এ সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা না থাকায় কিংবা ভুল ধারণা থাকায়, তাঁরা হয় শিক্ষার্থীকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য দান করতে পারেন না, অথবা সাহায্য করলেও ভুলভাবে করে থাকেন। শিক্ষার্থী যখন তার এই অবস্থা অন্যান্য শিক্ষার্থীর সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করে, তখন তাদের মনে নিজের পরিবার বা পিতা-মাতা সম্পর্কে হীনম্মন্যতাবোধ জাগ্রত হয়। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা অপসংগতিমূলক আচরণ করে থাকে। এই কারণে তারা অনেক সময় পিতা-মাতা সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে। পরিবারের মধ্যে পিতা-মাতার অজ্ঞতা থেকে, শিশুর বা শিক্ষার্থীর মধ্যে অনেক সময় কু-আচরণ করার অভ্যাস গঠিত হয়।

● (৩) **শিশুর প্রতি পিতা-মাতার বা পরিবারের অন্যান্য বয়স্কদের দৃষ্টিভঙ্গি** (Parental attitude) তার মধ্যে অপসংগতি সৃষ্টি করে থাকে। পরিবারের মধ্যে পিতা-মাতা বা বয়স্কেরা শিশুর প্রতি বা শিক্ষার্থীর প্রতি যথাযোগ্য মনোভাব প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হন। কোনো কোনো পরিবারে, শিক্ষার্থীর বিশেষ চাহিদাগুলির কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না; অবহেলাই করা হয়। আবার কোনো কোনো পরিবারে, শিক্ষার্থীর চাহিদাগুলিকে অত্যন্ত বেশি যত্নের সঙ্গে দেখা হয়। অবহেলা করার মনোভাব (Rejection) এবং অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা (overemphasis) দুই-ই শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক সংগতিবিধানের পক্ষে খারাপ। পরিবারের বয়স্করা অবহেলা করলে, শিক্ষার্থী নিরাপত্তার অভাববোধ করে। অন্যদিকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলে, শিশু নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং তার চাহিদার তালিকা বাড়তে থাকে। শিক্ষার্থীর মধ্যে আক্রমণাত্মক প্রবণতা,

Scanned with CamScanner